সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর, সত্য ও সুন্দরের পূজারি

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সময় সুব্রহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর যে বক্তৃতা দেন তাঁর শেষে তিনি বলেছিলেন,

কৃষ্ণবিবরের গাণিতিক তত্ত্ব একটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কিন্তু এর অনুশীলনের ফলে আমি প্রাচীন প্রবাদবাক্যের মৌলিক সত্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়েছি যে, 'সহজই হল সত্যের স্বাক্ষর' এবং 'সত্যের ঔজ্জ্বল্যই হল সৌন্দর্য'। 'সহজ', 'সত্য' এবং সৌন্দর্য' এসব কথা সাধারণত বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় না। সুন্দরের ধারণা এবং সারল্যের কল্পনা বিজ্ঞানে নেই বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু 'চন্দ্র' তাঁর সাম্প্রতিকতম 'সত্য এবং সুন্দর; বিজ্ঞানে সৌন্দর্যবোধ এবং অনুপ্রেরণা' গ্রন্থে বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যের প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, সুন্দরের মধ্যে পছন্দ করতে হলে সব বিজ্ঞানী বোধ হয় সুন্দরকেই বেছে নেন। বিজ্ঞান শুধু সত্যের অনুসন্ধান বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় সৌন্দর্যবোধ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আইনস্টাইন, ডিরাক এবং চন্দ্রশেখরের মতো সৌন্দর্যের পূজারি বিজ্ঞানী বারবার প্রমাণ করে গিয়েছেন।

চন্দ্র প্রথম সৌন্দর্যের সন্ধান পান সাদা-বামন তারার তত্ত্বে। আমাদের সূর্যসহ বিশ্বের অগনিত তারার শক্তির উৎস হল অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন গ্যাসের জ্বলুনি। যখন এই কেন্দ্রীয় মিথষ্ক্রিয়া শেষ হয়ে যায় তখনই ঘটে তারকার মৃত্যু। চন্দ্র উনিশ বছর বয়সে আবিষ্কার করেন যে, সব তারাই অন্তিম অবস্থায় সাদা-বামন হয়ে যায় না। শুধু সেইসব তারাই সাদা-বামন হয় যাদের ভর অল্প। এটাকেই বলে চন্দ্রশেখরের ভর-সীমানা। কিন্তু প্রশ্ন হল, বেশি ভরের ক্ষেত্রে কি হবে? এ ব্যাপারে চন্দ্র সেই উনিশ বছর বয়সেই লিখেছিলেন, '—অন্যান্য সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করতে হয়।' অন্যান্য সম্ভাবনার মধ্যে আসে নিউট্রন তারা (পালসার), দ্বৈততারা (বাইনারি) এবং সবশেষে চিররহস্যময় কৃষ্ণবিবর বা ব্ল্যাকহোল।

ঔজ্জ্বল্যের বিচারে সাদা তারার অবস্থান প্রধান ধারা বা মেইন সিকুয়েন্স তারার হার্তসপ্রুৎ-রাসেল লেখচিত্রের বাঁদিকে। এদের পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা ৫০০ থেকে ৫০,০০০ ডিগ্রি কেলভিন হতে পারে। আকার এদের খুব ছোট— সূর্যের ব্যাসের শতাংশ বা তারও কম এদের ব্যাস। অর্থাৎ আকৃতিতে সাদা-বামন তারা প্রায় পৃথিবীর মতো। কিন্তু ভর এদের সূর্যের ভরের কাছাকাছি, তাই তাদের ঘনত্ব বিপুল। বস্তু যখন অতি ঘনসংবদ্ধ তখন তার ইলেক্ট্রনগুলো আর ইচ্ছামতো বলগাহীনভাবে ছুটে বেড়াতে পারে না। এটাকেই বলে ডিজেনারেট বা অধঃপতিত ইলেক্ট্রন গ্যাস। সাদা-বামনের কেন্দ্রের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক কোটি থেকে দশ কোটি গ্রাম, এর তুলনায় আমাদের সূর্যের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র দেড়শ' গ্রাম।

এই বিপুল ঘনত্বের কারণ অবশ্য এই যে, কেন্দ্রীয় মিথষ্ক্রিয়ার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে বহির্মুখী চাপ আর থাকে না এবং অন্যদিকে অভিকর্ষের সংকোচন অব্যাহতই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত অধঃপতিত ইলেক্ট্রন গ্যাসের চাপ এই সংকোচন রোধ করতে পারে। এভাবে সাদা তারার সৃষ্টি হয়। যে সব তারার ভর আমাদের সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ শুধু সেগুলোই সুস্থির সাদা-বামন হিসেবে দেখা দিতে পারে।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে, জানুয়ারি মাসে চন্দ্র লন্ডনের অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির সভায় তাঁর উপযুক্ত ফল উপস্থাপন করেন। তাঁর আশা ছিল যে, তাঁর পথপ্রদর্শনকারী গবেষণা জ্যোতির্বিদমহলে স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, সেই সময়কার সবচেয়ে প্রভাবশালী জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন চন্দ্রশেখরের গবেষণাকে স্বীকৃতি তো দিলেনই না বরং তার বিরোধীতা করতে শুরু করলেন প্রকাশ্যেই।

'চন্দ্র'র গবেষণা ছিল তাত্ত্বিক, কেননা কোয়ান্টাম বলবিদ্যাই ইলেক্ট্রনের ডিজেনারেট বা অধঃপতিত অবস্থার কথা বলে যার থেকে স্বাভাবিকভাবেই আসে সাদা-বামন তারার প্রান্তিক ভর। চন্দ্রশেখরের ভাষায়, 'আদর্শ সাদা-বামনের এটাই আমরা সর্বোচ্চ ভর বলে ধরতে পারি' কেননা অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের চাপ এর বেশি ভর সহ্য করতে পারে না।

অবশ্যই এডিংটন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন এই সর্বোচ্চ সীমার গভীর তাৎপর্য কেননা এর ফলেই সৃষ্টি হবে চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষ্ণবিবর যা তিনি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির ঐ সভাতেই এডিংটন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তারা থেকে বিকিরণ চলতেই থাকবে এবং সংকোচন অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্যাসার্ধ কয়েক কিলোমিটারে নেমে আসে। তখন অভিকর্ষ এত শক্তিশালী হবে যে, তার বিকিরণকে ধরে রাখবে এবং তার তারকায় অন্তিম শান্তি নেমে আসবে।'

কিন্তু তারপরই এডিংটন যা বললেন তাঁর মনের কল্পনা, কোন বৈজ্ঞানিক কথা নয়, 'আপেক্ষিক তত্ত্বের অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত চরম অর্থহীন বলে মনে হয়। তারকাকে রক্ষা করতে অনেক কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে। তারচেয়েও বেশি রক্ষাকবচ আমি চাই। আমার মনে এই ধরনের অর্থহীন ব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রাকৃতিক আইন নিশ্চয়ই আছে।'

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক ব্যবহারকে এডিংটন অর্থহীন বললেও আজকাল একথা কেউ বলে না, কেননা ঐ ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান। ১৯৩৪ সালে চন্দ্র যা বলেছিলেন তা আজ সকলেই বিশ্বাস করেন যে, 'একটা অল্প ভরের তারার জীবন বৃত্তান্ত একটা বৃহৎ ভরের তারার জীবন বৃত্তান্ত থেকে অনেক আলাদা। কারণ, অল্প ভরের তারার জন্য স্বাভাবিক সাদা-বামন পর্যায় তার সম্পূর্ণ বিলোপের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। বৃহৎ তারা সাদা-বামন পর্যায় দিয়ে যায় না এবং তাদের জন্য অন্য সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে হয়।'

'শ্বেতবামন' তারা বলতে আমরা কি বুঝি? সহজ ভাষায় বলা যায় যে, এ ধরনের

বাংলাইন্টারনেট.কম

তারা ইলেক্ট্রনের একটা বিশাল 'প্লাজমা' ছাড়া আর কিছুই নয়। প্লাজমা কি? কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করলে তা যদি আয়নায়িত হয়ে যায় অর্থাৎ ইলেক্ট্রনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আমরা আহিত বস্তুকণার এক সমাবেশ পাই। এটাকেই বলে প্লাজমা, যা তরল বা বায়বীয় (ফ্লুইড) পদার্থের গুণসম্বলিত। এই ধরনের সমশক্তির ইলেক্ট্রনগুলো সর্বোচ্চ ঘনত্বে জমাট হয়ে থাকে। এই জমাট হওয়া এত দৃঢ় যে, শুধু কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পাউলির বর্জন-নীতি ইলেক্ট্রনগুলোকে আলাদা করে রাখতে পারে, কুলম্ব আইনের বিকর্ষণ নয়। অতিঘন জ্যোতিঃপদার্থ বস্তুতে এ ধরনের প্লাজমা থাকতে পারে, যেমন অধঃপতিত (Degenerate) তারকার অভ্যন্তরে। অধঃপতিত প্লাজমা উপস্থিত থাকতে পারে এমন তারকায় যাদের ভর সূর্যভরের এক হাজার ভাগের মতো (সূর্যভর হল ১.৯৮৯ × ১০^{৩৩} গ্রাম)। এ ধরনের অল্প ভরের বস্তুর মধ্যে থাকে প্রধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। এগুলো এত উত্তপ্ত হতে পারে যে, যার ফলে তাদের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন জ্বলুনির তাপকেন্দ্রীয় (thermonuclear) বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। অন্যদিকে, যেসব বস্তুর ভর সূর্যভরের ৮ শতাংশের অধিক তাদের সত্যিকারের তারকা বলা যায়। এসব তারকা স্ব-প্রোজ্জ্বল, কারণ তাদের অভ্যন্তরে তাপকেন্দ্রীয় জ্বলুনী থাকে।

যেসব তারকার ভর সাত দশমাংশ থেকে এক সূর্যভরের মধ্যে তারা এত ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে যে, তারা কখনই বিবর্তনের প্রধান ধারা (Main sequence) বা হাইড্রোজেন জ্বলুনি পর্যায় থেকে বাইরে যায় না। ছায়াপথে তাদের সমগ্র জীবনকাল হল এক হাজার থেকে দুই হাজার কোটি বছর।

যেসব তারকার প্রাথমিক ভর এক সূর্যভরের বেশি তাদের হাইড্রোজেন জ্বলুনি তাদের অভ্যন্তর ভাগ অধঃপতিত অবস্থায় পৌছানোর আগেই শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এদের অভ্যন্তরভাগ সংকুচিত হতে থাকে এবং তারপর হিলিয়াম জ্বলুনির তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া শুরু হয় যখন কেন্দ্রের চাপ এবং ঘনত্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তারকা বিবর্তনের এই পরবর্তী পর্যায় প্রাথমিক হাইড্রোজেন জ্বলুনি পর্যায় থেকে দ্রুততর। বিবর্তনের এই পর্যায়ে তারকা সক্রিয়ভাবে তার ভর পরিত্যাগ করতে পরে। যেসব তারার প্রাথমিক ভর এক থেকে ছয় বা আট সূর্যভর, তারা তাদের ভর এমন যথেষ্ট পরিমাণে পরিত্যাগ করতে পারে যাতে তাদের সক্রিয়, কেন্দ্রীয়-জ্বলুনি জীবনকাল শেষ হয়ে যায়। এসব তারকাকেই বলে শ্বেতবামন— যাদের ভর গড়ে সূর্যভরের পাঁচ-ছয় দশমাংশ। শ্বেতবামন তারকা তাই এমন সব জ্যোতিঃপদার্থ যা তাদের অভ্যন্তরের অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের চাপের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। শ্বেতবামনের সর্বোচ্চ ভর হল চন্দ্রশেখরের সীমানা যা ১.৪ সূর্যভরের সমান। এ ধরনের তারকার অভ্যন্তরের হিলিয়াম বা তার চেয়ে ভারি মৌলিক পদার্থ থাকে।

যেসব তারকার ভর সূর্যভরের আট গুণের বেশি তারা তাদের জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে ভর পরিত্যাগ করতে পারে না— যাতে তারা শ্বেতবামন হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের তারার অভ্যন্তর ভাগ সংকুচিত হতে থাকে। তারা ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব এবং তাপের পর্যায় দিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে তাপকেন্দ্রীন সংশ্লেষণ (Fusion) বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে ভারি কেন্দ্রীন তৈরি হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিক্রিয়া অভ্যন্তর ভাগকে লোহায় পরিবর্তিত করে দেয় কেননা লৌহ-কেন্দ্রীনের বাঁধুনীশক্তি সবেচেয়ে বেশি। এর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় তাই আর অতিরিক্ত শক্তি নিঃসৃত হয় না। লৌহ কেন্দ্রস্থলে ভর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা চারপাশে কেন্দ্রীন-জ্বলুনি-খোলস থেকে বস্তু প্রক্রিয়াজাত হয়ে অভ্যন্তরে আসে। কেন্দ্রস্থলের ভর ১.৪ সূর্যভরে অধিক হলে অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের চাপ আর যথেষ্ট হয় না, যা দিয়ে অভিকর্ষের অধীনে তারকার চুপসিয়ে যাওয়া বন্ধ করা যায়। তার ফলে যে সর্ববিধ্বংসী ধসের সৃষ্টি হয় তাতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লৌহ অভ্যন্তরের ঘনত্ব কেন্দ্রীন (nuclear) ঘনত্বের কাছে চলে আসে (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় ২ × ১০^{১৪} গ্রাম)। এভাবে চুপসানোর ফলে যে অভিকর্ষ শক্তি নির্গত হয় তার ফলে তারকার বেশির ভাগই একটা বিশাল সুপারনোভা বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। এই ধরনের বিস্ফোরণ কয়েক বছর আগে Sanduleak ৬৯২০২ তারকার বিস্ফোরণে দেখা গিয়েছে, যা পরবর্তীকালে SN ১৯৮৭ নামে পরিচিত হয়েছে। বিস্ফোরণের পর তারকার অবিশষ্টাংশের ভর দুই বা তিন সূর্যভরের কম হলে তাকে বলে নিউট্রন তারকা। নিউট্রন তারার অভ্যন্তরে অধঃপতিত নিউট্রনের চাপের জন্যই তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। অন্যদিকে অতিবৃহৎ তারকার চুপসানো কেন্দ্রস্থলের ভর এত বেশি থাকে যে, তা দিয়ে স্থায়ী নিউট্রন তারকা গঠন করা যায় না এবং এগুলি খুব সম্ভবত কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি করে— যা এত ঘন যে, তার মধ্যে থেকে আলোকও মুক্তি পেতে পারে না।

বাংলাইন্টারনেট.কম

কিন্তু এডিংটনকে এ কথা বোঝানো সম্ভব ছিল না এবং তাই শেষ পর্যন্ত চন্দ্র এডিংটনের ইংল্যান্ড ত্যাগ করে চলে গেলেন আমেরিকায়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো করেছেন। একটি ক্ল্যাসিক গ্রন্থে সাদা-বামন তারা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করে তিনি অন্য কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি একটা করে নতুন গবেষণার বিষয় ঠিক করেন, সে সম্বন্ধে কয়েক বছর কাজ করে একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং তারপর আবার নতুন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সব গবেষণাতেই থাকে ব্যাপক অনুসন্ধানের পরিচয়। আজকাল তাঁর সব কাজই ঐ বিষয়ের ওপর শেষ কথা, যেমন সাদা-বামনতারার ওপর তাঁর কাজ ছিল ঐ বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম কথা। তাঁর ঐ প্রথম কথা বুঝতে পৃথিবীর অনেক সময় লেগেছে, কেননা বহুকাল পর্যন্ত সাদা-বামন তত্ত্বের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যেত না। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় তাঁর সাদা-বামন তারার ওপরের কাজের কথা উল্লেখ করা হয় 'যা তিনি তাঁর বিশ বছর বয়সে করেছিলেন' এবং পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালের দিকে তিনি তারকার আপেক্ষিক তত্ত্বসম্মত অস্থিতিশীলতার ওপর যে কাজ করেন তারও উল্লেখ করা হয়।'

আমেরিকার বিজ্ঞানের জন্য চন্দ্রের অবদান বিপুল। তাঁকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার ক্লাসে নাকি ছাত্র মোট দু'জন?' চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, এবং ঐ দু'জন ছাত্র বেশ ভালই বোঝে বলে মনে হয়।" এই দু'জন ছাত্র ভবিষ্যতের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সি.এন. ইয়ং এবং টি.ডি.লি। উপমহাদেশের অন্য যে তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা কেউই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছাত্র সৃষ্টি করতে পারেননি। শিক্ষক হিসেবে চন্দ্র অনন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এজন্যই চন্দ্রকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন।

চন্দ্র অবশ্য ভারতে আসার কথা চিন্তা যে করেননি, তা নয়। স্যার সি.ভি. রামন যিনি চন্দ্রর পিতার ছোট ভাই এবং বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, তিনি চন্দ্রকে সহকারী অধ্যাপকের পদে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় চন্দ্র পিতার পরামর্শে এই আমন্ত্রণ সঙ্গত কারণে গ্রহণ করেননি। তারপর ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর জন্মস্থান লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদটি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তাঁর বন্ধু এস. চৌলার জন্য ঐ পদটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলে তাঁকে কোদাইকানাল মানমন্দিরের ডিরেক্টর পদে নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু তিনি প্রশাসনিক কাজ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এবারেও তাঁর ভারতে আসা হল না।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ড. হোমি ভাবা চন্দ্রকে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ গবেষণাগারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। চন্দ্র প্রলুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু এ সময়েই তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন, তাই আর তাঁর ভারতে চলে আসা হয়নি। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু চন্দ্র বলেছেন যে, এসবের মধ্যে হোমি ভাবার প্রস্তাবই তাঁর বোধ হয় গ্রহণ করা উচিত ছিল কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি।

একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানে অভ্যন্তরীণ চেহারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং তার অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হত না। স্যার সি.ভি. রামন ও মেঘনাদ সাহার কলহের কথা সকলেরই জানা এবং এর থেকে দূরে থাকা তিনি হয়তো শ্রেয় মনে করে থাকবেন। চন্দ্রের বন্ধু ছিলেন কে.এস. কৃষ্ণান যিনি রামন প্রক্রিয়ার মূল পরীক্ষণটি করেছিলেন তা তাঁর জানা ছিল। চন্দ্র হোমি ভাবাকে পছন্দ করতেন কিন্তু ভাবার এরিসটোক্রেসি অনেকের মতো তাঁকেও পীড়িত করত। প্রশাসনিক কাজ তাঁর পছন্দ হত না, কিন্ত এই উপমহাদেশে প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত না থাকলে কোন ব্যক্তিই সম্মান পায় না। এই উপমহাদেশের ট্রাজেডি এটাই যে চন্দ্রের মতো আজও কেউ যদি শুধু গবেষণায় লিপ্ত থাকতে চান, প্রশাসনিক কাজে না জড়িত হতে চান তবে তাঁকে চন্দ্রের মতোই দেশত্যাগী হতে হবে। এটাই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ঐতিহ্য যা উপমহাদেশে আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলছি।

সাদা-বামন তত্ত্ব নিয়ে এডিংটনের সঙ্গে চন্দ্রের বিবাদ তাই শুধু বৈজ্ঞানিক একতা মনে করা ভুল। ইংল্যান্ড কোন দিনই ভাবেনি যে, এই উপমহাদেশের মানুষ বিজ্ঞান করতে পারে। তাই জগদীশচন্দ্র বসু ইংল্যান্ডে স্বীকৃতি পাননি, সত্যেন বসু রাদারফোর্ডের ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ পাননি এবং সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখরকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে কোন আমন্ত্রণ করা হয়নি।

এডিংটনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের প্রসঙ্গে চন্দ্র লিখেছেন, 'এই ব্যাপারে এডিংটনের বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতি কি জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত। সহজ এবং সোজা উত্তর হল যে, তাঁর ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে ব্যাখ্যা করা যাবে না কিভাবে ভরসীমার অস্তিত্ব আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সূচিকর্মে অচ্ছেদ্যভাবে স্থান করে নিয়েছে। এই জ্যোতির্বিদ্যায় রয়েছে তারা বিবর্তনের জটিল নকশা, উচ্চ ঘনত্বের তারকার অভ্যন্তরে কেন্দ্রীন মিথষ্ক্রিয়া এবং অভিকর্ষজনিত ধসে পড়া প্রক্রিয়া যার থেকে সৃষ্টি হয় সুপারনোভা ঘটনা এবং প্রায় একই ভরের নিউট্রন তারা ও কৃষ্ণবিবরের জন্ম। আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি, 'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের একজন প্রথম দিকের এবং জোরালো সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এডিংটনের কাছে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ছিল না যে, তারার বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষ্ণবিবর সৃষ্টি হতে পারে।'

বিজ্ঞানের ইতিহাস চন্দ্রর আবিষ্কারকেই স্বীকৃতি দিয়েছে— এটাই তাঁর এবং উপশহাদেশের গৌরব।

বাংলাইন্টারনেট.কম